আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সমকালীন গবেষণার ধারা

আবুল কালাম*

সূচনা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন হচ্ছে একটি ব্যাপকতর বিশ্বকে নিয়ে। এই বিশ্বে যেমন রয়েছে প্রকৃতির গতিশীল ও চলমান স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তেমনি দেখা যায় প্রকৃতির অস্বাভাবিক গতিবিধি, এমনকি তান্ডব লীলা। সর্বোপরি বিশ্বে লক্ষ্যণীয় প্রকৃতির সৃষ্ট প্রাণী বিশেষ, বিশেষ করে কর্মমুখর মানুষের বিচরণ, তাদের বহুমুখী কর্মকান্ড। এইসব কর্মকান্ড নেতিবাচক হতে পারে, হতে পারে ইতিবাচক। বিশ্বে একদিকে যেমন প্রতিযোগিতা ও কলহ, রেষারেষি ও যুদ্ধ দ্বন্দ্ব চলে আসছে তেমনি রয়েছে বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতার সম্পর্ক, রয়েছে আলাপ-আলোচনা ও দরকষাকষি, যোগাযোগ ও লেনদেন, সহযোগিতা ও শান্তির বিষয় সম্পর্কিত আদান-প্রদান। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে কোন বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে তা বিভিন্ন ও বিস্তীর্ণ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ফলে অনেক সময়ে গবেষণা কাজে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। এর কারণ হচ্ছে মূলত গবেষণা কাজে পদ্ধতিগত বিদ্যমান জটিলতা ও বিভ্রান্তি, এমনকি অস্থিরতা এবং সংহতির অভাব।[১]

বস্তুত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণাধর্মী কর্মকান্ডে অনেক ধরনের বির্তকের অবতারণা করা হয়ে থাকে। এই বিতর্ক হচ্ছে অনেক কিছুকে ঘিরে। যেমন-তত্ত্ব, ধারণা, পদ্ধতি, দৃষ্টিকোণ, মডেল, কৌশল। অথবা অধিতব্য বিষয়ের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে কখনো কখনো বিতর্কের ভাব অবতারণা করা হয়ে থাকে; যেমন, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি।

অবশ্য একথা বলার অবকাশ নেই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞানান্বেষণের প্রক্রিয়া ও গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে এ ধরনের বিতর্ক বহু পূর্বেই অবতারণা করা হয় এবং প্রায় প্রতিটি বিষয়ে এ ধরনের বিতর্কের অবসান অনেকটা হয়েছে বলা চলে। অধিতব্য বিষয়

অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আপেক্ষিকভাবে নতুন, আর তাই এ বিষয়ে এসব বিতর্কের অবতারণাও হয়েছে অনেক পরে। ফলে অধিতব্য ও পদ্ধতিগত বিষয়গুলো সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এখনো বিতর্ক বিদ্যমান এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যেহেতু দ্রুত পরিবর্তনশীল সম্ভবত সেহেতু আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পদ্ধতিগত দিক সর্বদাই বিতর্কিত থেকে যাবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণা সম্পর্কিত এই চলমান বিতর্কের ধারা সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধে বিশেষ করে সনাতন ও সিস্টেম পদ্ধতি এবং দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত কয়েকটি বিশ্লেষণী কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণায় সাম্প্রতিককালে প্রচলিত রীতি–নীতি তুলে ধরা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নতুন অধিতব্য বিষয় হিসেবে পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে অনেক বিতর্কের অবতারণা করলেও এ ক্ষেত্রে গবেষকদের আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। নতুন নতুন বাস্তব অবস্থা, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার পাশাপাশি নতুন বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও উপায় সম্পর্কে ভাবনা–চিন্তা চলছে। অবশ্য দীর্ঘকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোতেও গবেষণা প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের প্রয়াস চলে আসছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কূটনৈতিক ইতিহাসের কথা উল্লেখ করা চলে। কূটনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণায় অনেকটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। ঐতিহাসিক এখন ইতিহাসের যুগ বা সভ্যতার বিবর্তনের মধ্যে তাঁর আগ্রহ সীমাবদ্ধ রাখছেন না। তাঁর আগ্রহের বিস্তার হয়েছে বিষয় ও নির্ধারিত সময়–কাল ভিত্তিক আঞ্চলিক কিংবা স্থানীয় ইতিহাসের দিকে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয় আর্থ–সামাজিক বা রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে। একই সঙ্গে এও বলা সত্য যে, ১৯৫০–এর দশকের প্রথম লগ্ন অবধি আন্তর্জাতিক বিষয়াদির অধ্যয়নে আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, তথা লীগ অব নেশন্স্ ও কূটনৈতিক ইতিহাসই ছিল প্রধান বাহন, এটাই ছিল আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত মুখ্য গবেষণা দৃষ্টিকোণ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়ে বিপ্লবী পরিবর্তন সাধিত হয়। দুই মহাযুদ্ধকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে অবশ্য বিষয়টি অনেকটা আবেগপ্রবণ কূটনৈতিক ইতিহাস–ভিত্তিক বিষয় ছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কেন মানুষ যুদ্ধে যায়। ভুলগুলো কোথায় হয় তা নির্ণয় করা এবং এমন সংস্থাসমূহ বের করা যাতে যুদ্ধকে বেআইনী ও অযৌক্তিক বলা সম্ভব হয়। বিষয়টি মূলত জোর দিয়েছিল কয়েকটি মূল্যবোধের ওপর। যথা, যুক্তিবাদী চিন্তা, নৈতিকতা, আইন ও আশাবাদী ভবিষ্যতের ওপর। উদ্দেশ্য অনেকটা কল্পনা–প্রসূত ছিল।

কিন্তু সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আচরণের জটিলতা শুধুমাত্র এই কয়টি অব্যাহত ধারা হিসেবে সনাতন বা চিরাচরিত পদ্ধতিতে বর্ণনা প্রদান কিংবা নিছক

আন্তর্জাতিক ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন সঠিক বলে বিবেচিত নয়; এমনকি সমকালীন ঐতিহাসিকদের নিকটও এ ধরনের পদ্ধতি সন্তোষজনক বলে বিবেচিত নয়।[২]

এ প্রসঙ্গে প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানী রেমন্ড আরো'র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে,

> "শুধুমাত্র ঘটনার সমষ্টি থেকে আমরা কিছু শিখতে পারিনা; একমাত্র ধারণার সংযোগ ও সমন্বয় এসব ঘটনাকে ভাবগত রূপ ও অর্থ প্রদান করতে পারে। ধারণার যোগসূত্রের সন্ধান প্রয়াস করা না হলে মুখ্য ও গৌণ বৈশিষ্টের মধ্যে ভেদাভেদ বের করা সম্ভব হয়না, বোঝা যায়না দুর্ঘটনা আর অন্তর্নিহিত ধারার প্রভেদ কোথায় এবং পদ্ধতিগত বিষয় তুলনা করে, যুগ থেকে যুগের পার্থক্য করে জ্ঞানের অণ্বেষণ করা হলেই বোঝা যায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে পরিচালিত আচার আচরণ।"[৩]

তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃত ভাবধারা জানার বাস্তব প্রয়োজনে ১৯৫০–এর দশক থেকে এ বিষয়ে পন্ডিত ও বিশ্লেষকবৃন্দ বিমূর্ত বা নির্বস্তুক বক্তব্যের পরিবর্তে বিশদ দৃষ্টান্ত বা নিয়মবদ্ধ (regularities) ধারার অন্বেষণ করে আসছেন। জে. ডেভিড সিঙ্গার এ ধরনের কাজকে ইতিহাস 'চুরমার' করার প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন।[৪]

অবশ্য একথা বলা সমীচীন যে, বিগত চার দশকের অব্যাহত প্রয়াস সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে এখনো কোন সাধারণ তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়নি বা কোন ধরনের তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কয়েক দশকের গবেষণার পরও এখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বহুবিধ ধারণা ও সংজ্ঞা, রূপরেখা ও কাঠামো সহ–অবস্থান করে চলছে। এসবই আন্তর্জাতিক আচরণের বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় দিক–নির্দেশনাদিয়েচলছে।

প্রশ্ন হতে পারে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া উদ্ভবের কারণ কি? এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা চলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ–উত্তর বাস্তবতার নিরিখে ঐতিহাসিক গতিময়তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক কারকের ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের কর্মকান্ডের ব্যাপকতর সম্প্রসারণ, সমকালীন পরিবেশ, প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব। এসব আন্তর্জাতিক আন্তক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। আন্তর্জাতিক কারকদের মধ্যে পরিলক্ষিত ও দ্বান্দ্বিক সিস্টেমে পরিলক্ষিত বৈশিষ্ট ও আচরণ অংশত হচ্ছে অতীত আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং অংশত চলতি ঘটনা ও পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকতার ফসল। এই প্রক্রিয়ায় দু'ধরনের উপাদানের সমন্বয় ঘটে : একদিকে ঐতিহাসিক ও অন্যদিকে প্রতিবেশ–পারিপার্শ্বিক; এ দুই উপাদানের উৎপত্তি যথাক্রমে অতীত অবস্থাজনিত অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য এবং নতুন পরিস্থিতি প্রসূত তাৎক্ষণিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণা প্রক্রিয়ায় ইতিহাস এক আবশ্যিক অঙ্গ বিশেষ।

কেননা এর মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ উদ্ভূত পরিস্থিতির ব্যাখ্যা শুধু মেলেনা, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান কালের আচরণেরও সাধারণ দিক–নির্দেশনা পাওয়া যায়।[৫]

প্রথিতযশা গ্রীক ইতিহাসবেত্তা থ্যুকিডাইডিস স্বয়ং দেখাতে চেয়েছেন যে, নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা নিরর্থক। যদিও ইতিহাস বিশ্লেষণের মৌলিক লক্ষ্য হবে ঘটনা প্রবাহের অন্তর্নিহিত ভাব, পূনঃসংঘঠিত ঘটনাপ্রবাহ বা ইতিহাসের গতিময়তা প্রকাশ করা।[৬] এতেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণায় ধারণাগত কাঠামো বা তত্ত্বীয় ভাব লব্ধ জ্ঞানান্বেষণ প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রচুর লেখালেখি হওয়া সত্ত্বেও পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, প্রচলিত তত্ত্বগত ভাবধারা এখনো এরূপ সংগঠিত রূপ নেয়নি যার রীতিবদ্ধ ব্যবহার গবেষণাকে সামঞ্জস্য দেবে ও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রকৃত পন্থা অবলম্বন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদও রয়েছে। কারো মতে গবেষকের উচিত হবেনা উত্থাপিত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে লাগামহীনভাবে নিশ্চিত যে কোনরূপ উত্তরের সন্ধান করা; বরং সমস্যার জটিলতা নির্ণয় করে সেই নিরিখে উচিত হবে সাময়িকভাবে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণী উপায় উদ্ভাবন করা।[৭] পক্ষান্তরে, অন্য কিছু বিশেষজ্ঞ কোন বিশেষ তত্ত্বের প্রতি সাধারণভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা অথবা জোড়াতালিভাবে একত্র করে কোন ধরনের জটিল কাঠামো তৈরী করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান করেন।[৮] অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, গবেষণা কোনরূপ পেশা নয়, পারিপার্শ্বিক জগতের বাস্তবতার সঙ্গে গবেষণা সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। একই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, সমালোচনামূলক, অনুসন্ধানী ও সৃষ্টিধর্মী সম্পর্ক উপস্থাপন পেশাদারী বৈজ্ঞানিকীকরণের মাধ্যমে সম্ভব নাও হতে পারে।[৯] তবু সাধারণভাবে তত্ত্বীয় উন্নয়নের বিষয় মনে রেখে গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে ঐতিহাসিক উপাদান ও সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে ধারণাগত বন্ধন বা যোগসূত্র স্থাপন করা যায়।।

সিস্টেম কাঠামো

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় সাম্প্রতিককালে সিস্টেম কাঠামো বেশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সিস্টেম তত্ত্ব মানুষ, রাষ্ট্রীয় সত্তা, জাতি রাষ্ট্র এবং তার পরিবেশ প্রতিবেশকে একটি বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে সংযুক্ত করতে প্রয়াসী হয়। এই তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ব্যক্তি বিশেষ বা মানুষের মূল্যবোধ, তার ব্যক্তিত্ব, তার প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যক্ষজ প্রভাব ইত্যাদির মাঝে ছোট ছোট উপাদান থেকে বৃহত্তর পরিমন্ডলের দিকে গবেষকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে – আন্তর্জাতিক আচরণে কোনরূপ ছন্দ, ভাবধারা বা কারণ রয়েছে কি? আনন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঘটনাপ্রবাহ কি কোন বৃহত্তর ধারায় সাজানো সম্ভব? এগুলো কি কোন ধরনের ধারা বা সিস্টেমের রূপরেখায় বিশ্লেষণ করা চলে? আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অনেক ধরনের ঘটনা ঘটে যা অদ্ভুত বলে মনে হবে। যেমন বলা চলে – তেমন কোন কথা নেই, বার্তা নেই অথচ এমন ঘটনা ঘটলো যার সূত্র ধরে

একটি আন্তর্জাতিক সংকট ঘটে গেল। অথবা দু'শত্রুপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের কোন বালাই নেই, অথচ রাতারাতি তারা উভয়ে একই টেবিলে ভাববিনিময় করছে। কখনো তারা হয় মুখোমুখি, কখনো বা সখ্যতা, কখনো উত্তেজনা বা সৈন্য সমাবেশ। আবার প্রশমিত সম্পর্ক বা দ্যঁতাত। সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বুঝার প্রবণতা রয়েছে যে, এসব ঘটনা সম্ভবত অসংলগ্ন, মূলত সম্পর্কচ্যুত। এসবের কারণ ব্যক্তি বিশেষ বা কেউর অহমিকা, রাষ্ট্র পর্যায়ে পরিবর্তনশীল নীতি কৌশল কিংবা বহুমুখী দুর্জ্ঞেয় ভাবপ্রবণতার মধ্যে নিহিত। এসব সম্ভবত কোন ধরনের তত্ত্বীয় বা ধারণাগত কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু যথার্থ কি তাই? কোন বিশেষ বিশেষ মূহুর্তে একটি ঘর ভর্তি মানুষকে কি কোন না কোন ভাবমূর্তির সংগে তুলনা করা চলেনা? যেমন, মানুষ হতে পারে উত্তেজিত বা শান্ত অথবা ভাবাবেগচিত্ত – বিভিন্ন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে।

বিশ্ব ভূমন্ডল বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রাযোজ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সিস্টেম–এর কথা ভাবা যায়। কেননা ক্ষুদ্রতর সামাজিক ইউনিটের মতো আন্তর্জাতিক পর্যায়েও রয়েছে ''সংঘটিত জটিলতা'' এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সিস্টেম–এর অবস্থান প্রণিধানযোগ্য। প্রশ্ন থাকে এর প্রকৃত সংজ্ঞাগত রূপ নিয়ে, বা কিভাবে এ সিস্টেম কাজ করছে কিংবা কিভাবে এর জটিলতা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সাধারণ মানুষের নিকট যা' জটিল, অস্বাভাবিক, অসংলগ্ন, বেসুর বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় বাস্তবে তা ভিন্নরূপ। প্রতিটি ঘটনা, সম্পর্ক হঠাৎ ঘটে যাওয়া নিছক ঘটনা বা সম্পর্ক মাত্রই নয় – এসব প্রকৃত অর্থে জটিলতার উর্ধ্বে, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, অনেকটা স্বকীয় ধারায় সম্পৃক্ত।

কত ধরনের গবেষণা দৃষ্টিকোণ থেকে সিস্টেম কাঠামো পর্যায় বোঝা যায়? অন্য কথায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জটিলতা কিভাবে বিশ্লেষণ করা চলে? এই জটিলতার কিভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়?

মর্টন কাপলান লিখেছেন সিস্টেম ও তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে, চার্লস ম্যাকল্যাল্যান্ড লিখেছেন দ্বন্দ্ব, সংকট ও সিস্টেম তত্ত্বকে নিয়ে, রিচার্ড রোজনক্রেন্স লিখেছেন বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ ও আন্তক্রিয়া ভিত্তিক সিস্টেম সম্পর্কে, মাইকেল হাঁস, মাইকেল ব্রেচার, ল্যানার্ড বাইন্ডার প্রমুখ লিখেছেন ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাব–সিস্টেম সম্পর্কে।

ব্রুস রাসেট ব্যবসা–বাণিজ্যিক সম্পর্ক, জাতিসংঘে ভোটাভুটি, আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদের ধারা প্রভৃতি বিবেচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে আঞ্চলিক বিন্যাস করে, আন্তর্জাতিক সিস্টেম –এর ধারার অনুসন্ধান করতে প্রয়াসী হন।

সিঙ্গার ও স্মল ১৮১৫ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত ১৫০ বছরের যুদ্ধ–বিগ্রহ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছান যে, ঐসব যুদ্ধ বিগ্রহে সহিংসতার মাত্রার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কিছু পর্যায় ছিলো যাতে কিছু না কিছু ধারা পরিলক্ষিত হয়। কুইনসী রাইট, পিরিটিম

সরোকিন, ল্যুইস এফ, রিচার্ডসন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞবৃন্দও ১৬৮০ সন থেকে অনুসন্ধান করে প্রতি ত্রিশ বছরে যুদ্ধের মাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করেন। এবং এসবকে সিস্টেম তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করেন।

যুদ্ধ বিগ্রহ আন্তর্জাতিক আচরণের একটি দিক মাত্র। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের ধারা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রতিনিয়তই বহুমুখী ঘটনা ঘটে চলছে। এসবের বিরাট অংশ হচ্ছে ইতিবাচক। মৈত্রী সম্পর্ক ও বন্ধুপ্রতিম জোট গঠন, ব্যবসায়িক লেনদেন, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, ক্রীড়া, ধর্মীয় ও ভাবের বন্ধন – এসবকিছুর সঙ্গেই ঘটনার 'স্রোত' বা 'প্রবাহ' বিজড়িত – বলা চলে এসবে রয়েছে ''ঘটনার আন্তক্রিয়া'। এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণায় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘঠিত অস্বাভাবিক আন্তর্জাতিক সংকট, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ–বিগ্রহের বিষয়ে শুধু সিস্টেম দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করা হয়নি,[১০] করা হয়েছে স্বাভাবিক বা সাধারণ ঘটনাপ্রবাহের ওপর, যার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সিস্টেম–এর বিভিন্ন রূপ বা বিভিন্ন পর্যয়ের ব্যাপকতা সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায়।[১১]

এভাবে সিস্টেম কাঠামোর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আচরণের একটি পরিচয় পাওয়া যায় বা ব্যাখ্যা প্রদান করা চলে। স্বাভাবিক কারণে এ ধরনের কাঠামোগত দৃষ্টিকোণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীবিশেষ, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বা অভ্যন্তরীণ গুণাগুণের উপর জোর দেওয়া হয়না, এমনকি এসবের যথার্থ ভূমিকা বা গুরুত্ব উপেক্ষা করা হয়। অবশ্য একটি সিস্টেম কাঠামোর মধ্যে 'সাব' বা উপ–সিস্টেম বা অঞ্চল সমূহকে সিস্টেম ধরে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ইউনিটগুলোর পারস্পরিক আন্তক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে উপসিস্টেম কাঠামো গড়ে ওঠে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।[১২] যেমন, বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কাঠামোর মধ্যে ইউরোপীয় গোষ্ঠী, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, আসিয়ান কিংবা সার্কভুক্ত দেশগুলোকে একটি উপসিস্টেম হিসাবে ভাবা যেতে পারে। আবার এসব অঞ্চলকে সিস্টেম হিসাবে প্রকল্প রূপ প্রদান করে রাষ্ট্র ইউনিটগুলোর প্রতিটিকে উপ–সিস্টেম হিসাবে বিশ্লেষণী কাঠামোতে আনা যেতে পারে।

দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ সম্পর্কিত গবেষণা

দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ–এ ধরনের প্রত্যয়গুলোর মধ্যে প্রকৃত সীমারেখা বেঁধে দেয়া মুশকিল, কেননা এগুলোর ভাব বা অর্থ নির্ভর করে পক্ষ–বিপক্ষের মন–মানসিকতার ওপর এবং নির্ভর করে কোন পর্যায় বা কতদুর পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাবে। নিকলসন তাই দ্বন্দ্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন একটি পরিস্থিতি হিসাবে যাতে দ্বন্দ্বরত পক্ষ–বিপক্ষ ''এমন কিছু কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে যা' পারস্পরিকভাবেও অসামঞ্জস্যমূলক''।[১৩] কেনেথ বল্ডিং একে আরো ব্যাখ্যা করেছেন বিশদ ধারণাগত কাঠামোর আলোকে। তাঁর মতে, দ্বন্দ্ব হচ্ছে এমন একটি ''প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি যাতে পক্ষ–বিপক্ষ তাদের নিজ নিজ সমঝোতামূলক অবস্থান সম্পর্কে সজাগ এবং

প্রতিটি পক্ষ অন্য পক্ষের কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের বিরুদ্ধে স্বীয়, লক্ষ্য অর্জনে অবস্থান গ্রহণকরে''।[১৪] যুদ্ধ হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির পরবর্তী পর্যায়, কেননা যুদ্ধকে দেখা হয় একটি দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি হিসাবে ''যাতে একটি রাষ্ট্র [বা অ–রাষ্ট্রীয় কারক] তার নীতিগত লক্ষ্য অর্জনে জোরপূর্বক সশস্ত্র পন্থাসহ এমন উপায় অবলম্বন করে যা প্রলম্বিত, সংঘবদ্ধ এবং কার্যকররূপে বিবেচিত এবং প্রতিপক্ষ এসবের মোকাবেলায় জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ সব ধরনের পাল্টা–প্রতিরোধ মূলক উপায় অবলম্বন করে।''[১৫]

যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়া রয়েছে – এ প্রক্রিয়া হচ্ছে সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া (escalation process)। প্রথিতযশা মার্কিন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিজ্ঞানী এ প্রক্রিয়ার সারাংশ ব্যাখ্যা করেছেন নিম্ন ভাষায়ঃ

> মৌখিক কথাকাটাকাটি বা বাক–বিতন্ডার পর বিবদমান পক্ষ–বিপক্ষ সরকারী পত্র বিনিময় করে থাকে; তারপর দ্বন্দ্ব–প্রান্তর বা রণাঙ্গনের কাছাকাছি কোথাও সশস্ত্র বাহিনীর আনাগোনা চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভবত কিছু সশস্ত্র লোকজন গোপনে ঢুকে পড়ে প্রকাশ্যে করতে পারে অবতরণ। ফলে দ্বন্দ্ব হয় সম্প্রসারিত। মিত্রশক্তিবর্গ পা বাড়ায় পক্ষে–বিপক্ষে, চলে হুমকি, পাল্টা–হুমকির পালা। শুরু হয় প্রতিশোধ ও পাল্টা প্রতিশোধের প্রক্রিয়া এবং এভাবে সম্প্রসারিত দ্বন্দ্বের ধারার পরিণতিতে পুরোদমে যুদ্ধ হয় অবধারিত। এ ধরনের যুদ্ধ স্থানীয় পর্যায়ে শুরু হলে বৃহৎ শক্তিবর্গের জড়িয়ে পড়া অমূলক নয়।[১৬]

এভাবে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়াগতভবে। এগুলোর ব্যাপকতা এবং বহিঃপ্রকাশও সম্পর্কযুক্ত। তাই সমাজবিজ্ঞানী জোয়ান গাল্টুং যুদ্ধদ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াতে একটি ত্রিকোণ বন্ধনী সূত্রে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হন। তাঁর মতে, দ্বন্দ্ব (Conflict) পক্ষ–বিপক্ষের প্রত্যয়জ অনুভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গিকে (Attitude) প্রভাবিত করে, আর তা প্রতিফলিত হয় তাদের কূটনৈতিক ও কৌশলগত আচরণে (Behaviour)। এভাবে দ্বন্দ্বের সূত্র থেকে ভুল ধারণা বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি হয় এবং তার ফলশ্রুতিতে নেতিবাচক আচরণ বা আরো দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে, শুরু হতে পারে যুদ্ধ। (দ্রষ্টব্য চিত্র–১)।[১৭]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কোন দ্বন্দ্বই সম্ভবত স্থানীয় দ্বন্দ্ব নয়। কেননা বিশ্বের যে–কোন অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে কোন দ্বন্দ্ব শুরু হলেও তা অচিরেই আন্তর্জাতিক চরিত্র বা রূপ পরিগ্রহ করে। ভূ–রাজনীতির চিন্তাবিদ নিকোলাস স্পাইক্‌ম্যান তাই যথার্থই লিখেছেন, সমকালীন বিশ্বে যুদ্ধ ও শান্তি দু'টোই বৈশ্বিক, কেননা বিশ্বের সকল এলাকা ও সকল অঞ্চল পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোনটার দূরত্ব কোনটি থেকে কতখানি সেই বিষয় আর মৌলিক নয় – একটির ক্ষেত্রে সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা অপরটির ওপর প্রভাব ফেলবে তা অনিবার্য ও অবধারিত ভাবে।[১৮] স্পাইক্‌ম্যান তাই দ্বন্দ্বের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, পাশাপাশি তিনি ভেবেছেন শান্তির বিষয়। তাঁর মতে, সমকালে যুদ্ধ–দ্বন্দ্ব যখন সর্বব্যাপী রূপ ধারণ করেছে আদর্শগতভাবে,

শীতল বা উষ্ণ ভাবধারায়, শান্তির প্রয়াসও চলতে হবে সমগ্র বিশ্বকে কেন্দ্র করে, সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন অঙ্গ বা অঞ্চলকে দেখতে হবে একক ও অভিন্নভাবে যাতে শান্তি প্রক্রিয়া তার মূল না হারায়।[১৯]

তাই বলা সমীচীন যে, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব ও শান্তি একই ধারায় সম্পৃক্ত। শান্তির সমস্যা বুঝতে হলে বুঝতে হবে শান্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দ্বন্দ্বকে, জানতে হবে সেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যার থেকে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। ধারাগত দৃষ্টিকোণ থেকে, কোন একটিমাত্র দিক থেকে দ্বন্দ্বের যথার্থ বিশ্লেষণ করা কঠিন, কেননা দ্বন্দ্ব মাত্রই জটিল এবং এর বহুবিধ কারণ থাকতে পারে – যেমন, প্রযুক্তিক, সামাজিক, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত। এই পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিও অনেক সমন্বিত বা সম্মিলিত উপাদানের বলে বিবেচিত। তাই শান্তি, অনেকের মতে, দ্বন্দ্বের ফসল বিশেষ, এমনকি এ হচ্ছে দ্বন্দ্বেরই একটি বৈশিষ্ট বা অভিব্যক্তি। এর অর্থ হচ্ছে, গবেষণা ও গবেষকের কাজ হবে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ধারা চিহ্নিত করা। চিহ্নিত করতে হবে দ্বন্দ্বরত পক্ষ–বিপক্ষের মৈত্রী সম্পর্কের যোগাযোগ এবং পরিশেষে দেখতে হবে কিভাবে এসব শান্তির প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।[২০]

বিখ্যাত জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী শিমেলও মনে করেন যে, শান্তি ও দ্বন্দ্ব একই অবিচ্ছিন্ন ধারায় সম্পৃক্ত, কেননা ধারণা হিসেবে শান্তি হচ্ছে দ্বন্দ্বেরই ইতিবাচক ফসলস্বরূপ এবং দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বৈষম্যমূলক ভিন্নমুখী দ্বৈতধারা ও উত্তেজনার মীমাংসা করা। আর এ কারণেই শিমেল মনে করেন যে, দ্বন্দ্ব ও শান্তি সমাজ জীবনে একইসূত্রে গ্রথিত। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে, ''শান্তির প্রতি পর্যায়ে ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্বের অবস্থা নিহিত এবং প্রতিটি দ্বন্দ্বে ভবিষ্যৎ শান্তির সম্ভাবনা বিরাজমান।''[২১]

শান্তি গবেষণা

শান্তি গবেষণা কি, কি ধরনের সমস্যা এর মধ্যে রয়েছে, কি কি বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত? শান্তি গবেষণার জনক গালটুং স্বয়ং একে চিহ্নিত করেছেন এমন একটি বিষয় হিসেবে যাতে ''শান্তির অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা চলে – দেখা হয় এ অবস্থার অতীত ও বর্তমানকে ঘিরে কিভাবে ভবিষ্যত শান্তি সুনিশ্চিত করা যায়।''[২২] গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু, মূল্যবোধ, পদ্ধতি, শিক্ষাজ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ প্রভৃতির আলোকে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া যেতে পারে। কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে শান্তি গবেষণা সমাজের প্রতিটি স্তরে দ্বান্দ্বিক পরিপ্রেক্ষিত পরিহার, শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের অবস্থা ও প্রবণতা সৃষ্টি করতে প্রধানত সচেষ্ট। মূল্যবোধের দিক থেকে শান্তি গবেষণা মানবতা ও প্রগতিবাদী, অর্থাৎ ক্ষমতার ব্যবহারের চূড়ান্ত লক্ষ্যে নীতিজ্ঞানহীন ও দায়িত্বজ্ঞান বিবর্জিত আচরণ প্রত্যাখ্যানে বিশ্বাসী। পদ্ধতিগত দিক থেকে শান্তি গবেষণা রীতিবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বস্তুনিষ্ঠ ও অনুকরণীয় জ্ঞানান্বেষণে প্রয়াসী; তার মানে, এতে নিছক মূল্যবোধ বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করবে না। শিক্ষাগত জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি আন্তঃবিষয়ক, অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ের দর্শন ও ধারণা এতে

স্থান লাভ করে।[২৩] শান্তি গবেষণা আন্তর্জাতিক এ অর্থে যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতিগত সীমারেখা ভেদ করে শান্তির সমস্যাকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় সমষ্টির স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে।[২৪]

শান্তি গবেষণাকে একটি *প্রক্রিয়া* হিসেবেও দেখা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানোর বিষয় বোঝানো হয় যে, পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সম্পর্ক এমন পর্যায় পৌঁছিবে যখন *উন্নয়ন* ঘটতে পারে।[২৫] তার মানে শান্তি গবেষণালব্ধ জ্ঞান সম্পর্ককে অশান্ত পর্যায় থেকে শান্তিপূর্ণ পর্যায়ে স্থিতিশীল করতে পারে। আবার শান্তির এ প্রক্রিয়াকে দ্বন্দ্ব–ব্যবস্থপনা কৌশল হিসেবেও দেখা হয় এবং এক্ষেত্রে এর সাফল্য কিংবা প্রাসঙ্গিকতা মোটামুটি নির্ভর করে দ্বন্দ্বের কোন পর্যায়ে এ কৌশল ব্যবহৃত হবে। আপেক্ষিক শক্তি সাম্য ভিত্তিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব–ব্যবস্থাপনা কৌশল সফল হতে পারে।[২৬] আরেকটি ধারণার বিষয় বলা হয়ে থাকে 'পারস্পরিকতা (mutuality) – যার অর্থ আধিপত্য বা কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা প্রত্যাখ্যান করা এবং এসবের পরিবর্তে "পাস্পরিক সাহায্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার" ওপর জোর দেয়া হয়।[২৭]

গালটুং–এর দৃষ্টিতে শান্তি ও সহিংসা সম্পর্কযুক্ত। সহিংসা দু'ধরনের রূপ পরিগ্রহ করেঃ প্রাতিজনিক সহিংসা (Personal violence) ও কাঠামোগত সহিংসা (structural violence) প্রাতিজানিক সহিংসা প্রত্যক্ষ, প্রকাশ্য ও দৈহিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং কাঠামোগত সহিংসা হতে পারে পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ, কিন্তু এর মাধ্যমে সামাজিক অবিচার বা শক্তি ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা রক্ষা করার প্রয়াস চলে।

এই দু'ধরনের সহিংসা থেকে অব্যাহতি পেলে দু'ধরনের শান্তির উন্মেষ ঘটতে পারে – প্রাতিজনিক সহিংসামুক্ত অবস্থা 'নেতিবাচক শান্তি' রূপে (negative peace) পরিগণিত এবং কাঠামোগত সহিংসামুক্ত অবস্থাকে বলা হয় 'ইতিবাচক শান্তি' (positive peace)।[২৮] (দ্রঃ চিত্র – ১ এবং ২)। নেতিবাচক শান্তি যুদ্ধ দ্বন্দ্ব ও কলহমুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করে এবং ইতিবাচক শান্তি উন্নয়নের গতি সঞ্চার করে, সুগম করে পারস্পরিকতার পথ, সম্পর্ক সুসংহত করে।

এভাবে শান্তির ব্যাপক অর্থে শুধুমাত্র প্রাতিজনিক ও প্রত্যক্ষ সহিংসা পরিহার করার কথা বলা হয় না, 'উল্লম্ব উন্নয়ন' (vertical development) ধারায় সমাজের বৃহত্তর জনমানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার প্রয়াস বর্জন করা অবধারিত হয়ে পড়ে।

গালটুং–এর শান্তি তত্ত্ব এভাবে শুধু দ্বন্দ্ব তত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত নয়, উন্নয়ন তত্ত্বের সঙ্গেও বিজড়িত। এদিক থেকে বলা যায় যে, শান্তি গবেষণা জ্ঞানচর্চার একটি শাখা হিসাবে শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নয়, এতে

দ্বন্দ্ব ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কঠিন ও জটিলতর বিষয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। দ্বন্দ্ব গবেষণা নেতিবাচক শান্তি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, আর উন্নয়ন গবেষণা অধিকতর ইতিবাচক শান্তির পথ সুগম করে, কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে এসব একে অপরের পরিপূরক।[২৯]

চিত্র – ১ঃ যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, শান্তির বৃত্তাকার ও ত্রিকোণ মডেল

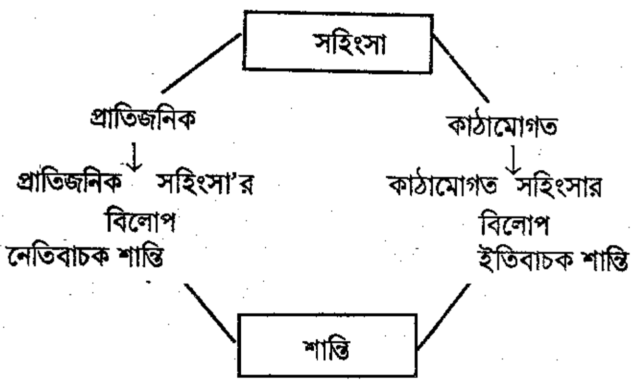

চিত্র – ২ ঃ সহিংসা ও শান্তির মডেল

গালটুং-এর এই সহিংসা ও শান্তির মডেল তার ``Violence, Peace and Peace Research" প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে কেবলমাত্র শান্তির অবস্থা নিয়ে গবেষণা করা হয় বলা কি সঠিক? এ ধরনের লক্ষ্য নির্ধারণ অনেকটা একপেশে বলে বিবেচিত হতে পারে এবং অনেক গবেষক এ ধরনের সংজ্ঞায়িত লক্ষ্য স্থির করার বিপক্ষে। কেননা, এতে বিষয়ের বিবর্তন বিঘ্নিত হতে পারে। শান্তি গবেষণার বিষয়গত সীমানা এখনো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়নি এবং এ বিষয়ে তেমন কোন সাধারণ সমঝোতাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

শান্তি গবেষকেরা অবশ্য শান্তির সমস্যা সমাধানে বহু ধরনের বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের কথা বলে থাকেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ক্রীড়া তত্ত্ব (Game theory) যা একটি কৌশলগত দৃষ্টিকোণ হিসেবে পরিচিত। এ তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে কিছুটা বিমূর্ত ধরনের যৌক্তিকতা। এতে সমন্বয় ঘটে অংক ও যুক্তিশাস্ত্রের। একে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্বের একটি বিশেষ অভিব্যক্তিও বলা চলে, বিশেষ করে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ অনুধাবনের একটি পদ্ধতিও বলা যেতে পারে।[৩০] টমাস শেলিং এ ধরনের পরিস্থিতির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ''ক্রীড়ার'' 'রণনীতি' হিসেবে, যা কার্যত ক্রীড়ার দক্ষতা বা ক্রীড়ার সুযোগের থেকে ভিন্নতর; এধরনের ক্রীড়ার রণনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সবচাইতে ভালো পথ/কার্যক্রম হচ্ছে প্রতিপক্ষকে তার আপন আশানুরূপ কাজে প্রবৃত্ত করা''।[৩১] এতে বিপক্ষের স্বার্থ জলাঞ্জলী হয়, চরিতার্থ হয় নিজ স্বার্থ।

এনাটল র‍্যাপোপোর্ট–এর আরো ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তার মতে, এটা সম্ভব যে ক্রীড়াতত্ত্বের কিছু কিছু ধারণা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সামনে উপস্থিত সম্ভাব্য বিকল্পগুলো চিহ্নিতকরণে বিশ্লেষকদের জন্য সহায়ক হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সম্ভবত বিশ্লেষকেরা উপস্থিত সমস্যা নিছক মৌখিক বর্ণনার পরিধি অতিক্রম করে এর গভীরে অনুপ্রবেশ করতে প্রয়াসী হতে পারে, জানতে পারে সমস্যার সাধারণ বা সার্বিক ব্যাপকতা ও এর ব্যাপকতর অভিব্যক্তি।[৩২]

অবশ্য ক্রীড়া তাত্ত্বিকরা নিজেরাও এ বিষয়ে একমত যে, ক্রীড়া তত্ত্ব তার বর্তমান প্রবণতার দিক থেকে উদ্ভুত যে কোন পরিস্থিতিতে পক্ষ–বিপক্ষের জয়লাভের প্রত্যাশিত দৃষ্টিকোণ বিচার–বিবেচনা করে ''যুক্তিযুক্তভাবে সঠিক'' বিকল্প পথ চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হন;[৩৩] কিন্তু বাস্তব দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃত আচরণ যে কিরূপ হবে তার নিশ্চয়তা কোন ক্রীড়া তাত্ত্বিক নির্ধারণ করতে পারেন না। কেননা দ্বান্দ্বিক অবস্থায় বা সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা অযৌক্তিকভাবে বা ভাবাবেগ চিত্তে আচরণ করতে পারেনা। অথচ ক্রীড়া তাত্ত্বিকরা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে যুক্তিযুক্ত আচরণ ধরেই রাখেন, কেননা বাস্তব জীবনের চেয়ে তাদের নিকট সম্ভবত তত্ত্বীয় ভিত গড়ে তোলাই অধিকতর প্রাসঙ্গিক।

অন্য কথায়, ক্রীড়া তাত্ত্বিকরা দ্বন্দ্বরত মানুষের মৌলিক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক আচরণে বিশ্লেষণের দিকটা সম্পর্কে তেমন একটা মাথা ঘামান না, তাঁরা জোর দেন গাণিতিক–যৌক্তিক উপাদানের ওপর। যদিও র‍্যাপোপোর্টের মতে, রণনীতির

নাটক অনেকক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর যঙ্গে জড়িত, ক্রীড়া তত্ত্বে এসবের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শিত হয় না। বলা সমীচীন যে, ক্রীড়া তত্ত্বের খেলা চলে খেলার বোর্ডে। রণনীতির শুধুমাত্র যুক্তিযুক্ত দিকগুলোতে এর আগ্রহ।''[৩৪] উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতিভাত হবে যে, ''ক্রীড়ার'' বিশ্লেষণী কাঠামোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুধাবন করা সহজ নয়, যদিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারা ও প্রক্রিয়ায় অনেক সময় অনেক ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

ক্রীড়া তাত্ত্বিকরা শূন্যমান অবস্থা বা পরিস্থিতিকে (Zero-sum situation) শান্তির প্রতিকূল বলে মনে করেন। শিমেল এ অবস্থাকে ''সমঝোতার চরম নেতিবাচক'' দিক বলে অভিহিত করেন। এতে দ্বন্দ্বরত পক্ষ-বিপক্ষের যে-কোন একটিকে পুরো হারতে হয় – দু'পক্ষের স্বার্থের সমঝোতা এতে চলেনা। বস্তুত, শূন্যমান অবস্থা হচ্ছে পুরোপুরি হারজিতের খেলা – যে-খেলায় দ্বন্দ্বরত পক্ষ-বিপক্ষ তাদের অসামঞ্জস্য অবস্থানের বাস্তবায়নে একে-অপরের মুখোমুখি রণনীতি গ্রহণ করে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতি শান্তি প্রক্রিয়ার সামনে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে, কেননা দ্বন্দ্বরত উভয়পক্ষের রণনীতির শর্তাবলী কোনরূপ মধ্যস্থতার মাধ্যমে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে শান্তি প্রক্রিয়ার ভূমিকা এভাবে দেখা যেতে পারেঃ

> শান্তির ফর্মূলার কাজ হবে এক পক্ষের কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। এবং বিপক্ষকে ব্যর্থ মনোরথ করা। অন্যকথায়, এতে এক পক্ষের হয় বিজয়, আরেক পক্ষের পরাজয়ের গ্লানি মেনে নিতে হয়।[৩৫]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মূর্ত তত্ত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে নিবারণ তত্ত্ব (deterrence theory) যা' স্নায়ুযুদ্ধকালের সরলীকরণ তত্ত্ব পর্যায় অতিক্রম করে একটি 'প্রভাব তত্ত্বের' (influence theory) রূপ পরিগ্রহ করে। স্নায়ুযুদ্ধকালের বিমূর্ত নিবারণ তত্ত্ব ছিল অধিকমাত্রায় হুমকি ও শাস্তির ভয় ভিত্তিক বা নেতিবাচক, কিন্তু মূর্ত পদ্ধতি সমন্বিত প্রভাব-তত্ত্বে বহুমুখী কৌশলগত আন্তক্রিয়া বিজড়িত – যা' ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ভাবেই সমন্বিত হতে পারে। এক্ষেত্রে নিবারণ তত্ত্ব বহুমুখী প্রভাব তত্ত্বের অংশবিশেষ হতে পারে, যাতে এ তত্ত্ব একক বা সমন্বিতভাবে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত না করে ইতিবাচক দিকে প্রভাবিত করতে পারে। নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আন্তরাষ্ট্রিক সম্পর্কে দ্বান্দ্বিকপ্রবণতাকে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন নিবারণ তত্ত্বে দু'ধরনের কারণ বিজড়িত, আত্মরক্ষাকারী (defender), যে তার আপন অবস্থান (status quo) বজায় রাখতে প্রয়াসী, আর অন্যদিকে থাকে উদ্যোগকারী (initiator), যে অবস্থার স্থিতি পরিবর্তন ঘটাতে সক্রিয়। যে-কোন সংকটজনক পরিস্থিতিতে উপরিউক্ত দু'ধরনের কারক আন্তক্রিয়া বিজড়িত হয়ে সৃষ্টি করে তিনটি ধারণাগত পর্যায় বা স্তর ঃ অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি, উদ্যোগ, ও প্রতিক্রিয়া (ইংরেজীতে যথাক্রমে Commitment, initiation, and response)। তিনটি স্তরই একে অপরের সঙ্গে এক গতিশীলতার বন্ধনে আবদ্ধ।

ঐতিহ্যিক নিবারণ তত্ত্ব বলা চলে প্রথম স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল যাতে পক্ষ–বিপক্ষ গতিশীলতার দিকে না গিয়ে প্রায়শই সম্প্রসারণ মুখী প্রবণতায় জড়িয়ে যেত (দ্রঃ চিত্র–৩), কিন্তু নতুন মডেলে নিবারণ প্রক্রিয়ায় পক্ষ–বিপক্ষ ক্রমাগত একে অপরের উদ্দেশ্যে ও কর্মকান্ড যাচাই করে থাকে, বিজড়িত হয় আন্তঃক্রিয়ায়, যাদের পরস্পরের হিসেব–নিকেশ, আদর্শ–উদ্দেশ্য এবং এসব সম্পর্কিত ধ্যান–ধারণা ও অঙ্গীকারসমূহ মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন করে থাকে। অবশ্য এও বলা সাধারণ যে, এ ধরনের নিবারণ মডেল সাধারণ রাজনৈতিক আন্তঃক্রিয়া মডেলের (general political interaction model) সীমারেখার কাছাকাছি।[৩৬]

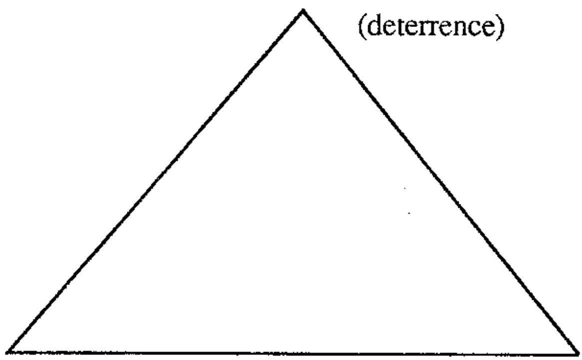

চিত্র – ৩ ঃ নিবারণ তত্ত্বের ত্রিকোণ মডেল

গবেষণার বিশ্ব প্রেক্ষাপট

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণা শুধু অতীত ও বর্তমানকে ঘিরে নয়, ভবিষ্যৎ কেন্দ্রিকও। যেমন, স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি বলে বিবেচিত। এ পরাশক্তির পরিচয় শুধু সামরিক শক্তি বা ক্ষমতা ভিত্তিক নয়, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ভিত্তিকও বটে। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও সমগ্র পূর্ব ইউরোপে অসাধারণ পরিবর্তনের পর বিশ্বে মার্কিন নিরাপত্তা নীতি কি হবে এবং কি ধরনের রণনীতি ও রণকৌশল সেই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারে? এ নিয়ে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যেমন বিতর্ক চলছে বহির্বিশ্বেও তেমনি জিজ্ঞাসা ও বিতর্কের শেষ নেই।[৩৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ–উত্তরকালে ক্রমান্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সেরা শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয় এবং কম্যুনিষ্ট সম্প্রসারণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪০–এর দশকের শেষপাদ থেকে সীমিতকরণ নীতি (Containment Policy) গ্রহণ করে। পারমাণবিক পরিপ্রেক্ষিত ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি ওয়াশিংটন ১৯৫০–এর দশক থেকে পারমাণবিক ধ্যান–ধারণা ভিত্তিক নিবারক রণনীতি (deterrent stratagy) প্রণয়ন ও প্রচারণায় তৎপর হয়। ১৯৫৪ সন থেকে মার্কিন নেতৃবর্গ উত্থাপন করে "ভয়াবহ প্রতিশোধ" (`massive retaliation") রণনীতি, ১৯৬০–এর দশকের প্রথম দিকে ব্যক্ত হয় "নমনীয় প্রতিক্রিয়া" (`Flexible response"), একই দশকের শেষভাগে "বাস্তবানুগ নিবারণ" (realistic deterrence") রণনীতির ধারণা বাস্তবায়নের প্রয়াস চলে এবং পরিশেষে ১৯৭০–এর দশক থেকে বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত সম্প্রসারণ মূলক উদ্যোগ প্রতিহত কল্পে যুক্তরাষ্ট্র "সম্প্রসারিত নিবারণ" (extended deterrence") রণনীতি অনুযায়ী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও পূর্ব ইউরোপের অভাবিত রূপান্তর পরোক্ষভাবে হলেও মার্কিন নিরাপত্তা নীতি এবং তার রণনীতি ও রণকৌশলের সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে। মার্কিন নেতৃত্বে ইরাকের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির শাস্তিমূলক যৌথ সামরিক ব্যবস্থা (আগষ্ট ১৯৯০–ফেব্রুয়ারী ১৯৯১) মূলত বিশ্বব্যাপী একক মার্কিন নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

বিশ্বের শক্তি কাঠামোয় দ্বিমেরুকরণের অবসান হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বে মার্কিন নেতৃত্ব সম্ভবত সন্দেহাতীত নয়। এখনো মার্কিন উপকূলভাগের কাছাকাছি উগ্র কম্যুনিষ্ট আদর্শের প্রতীক কিউবা সদর্পে অবস্থান করছে। আমেরিকা মহাদেশগুলোতে মার্কিন কর্তৃত্ব নানাভাবে হুমকির সম্মুখীন। সামরিকভাবে মার্কিন প্রাধান্য সন্দেহাতীত হলেও এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ সহজ নয়। অন্যান্য মহাদেশগুলোতে আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে এবং স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে এসব আঞ্চলিক শক্তি কর্তৃত্ব স্থাপনে প্রয়াসী। এসব ক্ষেত্রে মার্কিন ভূমিকা–মার্কিন কৌশলগত স্বার্থ কোথায় নিহিত, কি হবে মার্কিন রণনীতি – এসব নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছে মার্কিন নীতি নির্ধারকদের মধ্যে, বিভিন্ন পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করছেন বিশ্লেষকবর্গ।[৩৮] অন্যদিকে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুকরণ ও বাজার অর্থনীতি প্রচলন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বব্যাপী মার্কিন অনুকরণপ্রিয়তা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হয়।[৩৯] কিন্তু এ ধরনের প্রভাব কতখানি স্থায়িত্ব বা গতিশীলতা লাভ করবে তা নিয়ে প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অবস্থানের প্রতি হুমকি শুধু উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের উঠতি শক্তিগুলো থেকে আসতে পারে তা' নয়, মার্কিন মিত্রদেশগুলোর কোন না কোনটিও প্রতিযোগী শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে যেমন, বিশ্বের নিরাপত্তা

কাঠামোতে জাপান ও ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর ভবিষ্যৎ কৌশলগত অবস্থান কি হবে তা নিয়েও যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনার অবকাশ রয়েছে, কেননা উভয় শক্তির সামরিক শক্তির ঐতিহ্য ও সম্ভাবনা দু'টোই রয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সম্প্রতি উভয় শক্তি জাতিংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ দাবি করেছে। এ বিষয়ে ওয়াশিংটন এ পর্যন্ত নেতিবাচক ভাব ব্যক্ত করেছে, কিন্তু কতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ দ'ুটো দেশকে বিশ্ব শক্তি কাঠামো থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?

এ ছাড়া বিশ্বে অস্ত্র রাজনীতির ধারা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস সম্পর্কিত আলোচনায় ইতিমধ্যেই পূর্বের ধারার ছেদ ঘটেছে, কেননা মস্কো তার দরকষাকষির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং এর ফলে রাশিয়া ও স্বাধীন কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলোকে অনেকটা একতরফাভাবে অস্ত্র হ্রাস বা নির্মূল করতে হচ্ছে। তবু পারমাণবিক অস্ত্র সামগ্রীর ক্ষেত্রে বিগত চার দশকব্যাপী ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে, যদিও বহুল আলোচিত মহাকাশ ভিত্তিক মার্কিন কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ-এর (SDI) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে ওয়াশিংটন এখনো নিবৃত্ত হয়নি।

অবশ্য বিশ্বব্যাপী অহিংসতার প্রবণতা বৃদ্দি, উপজাতীয়-জাতীয়তাবাদের প্রসার, গৃহযুদ্ধ ও ভাঙনের পালা, সীমান্ত সংঘর্ষ, স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃত্বের লড়াই প্রভৃতি কারণে চিরায়িত অস্ত্র শস্ত্রের কদর বেড়ে চলছে, বাড়ছে এসবের নতুন উদ্ভাবনের প্রয়াস ও প্রসার। তৃতীয় বিশ্বে বহুদেশ শুধু উন্নততর বিশ্ব থেকে অস্ত্র আমদানী করছে না, নিজেরাও ব্যাপক হারে অস্ত্র উৎপাদন করে চলছে। এও অবশ্য সত্য যে, ইউরোপ ও এশিয়ায় ইতিবাচক সম্পর্কের প্রক্রিয়াও চলছে। ইউরোপীয় গোষ্ঠী, আসিয়ান, সার্ক, অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, এমনকি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষকবর্গ এসবের মনস্তাত্ত্বিক দিক, উৎস, প্রভাব ও ফলাফল প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের কাঠামো বা শান্তির রূপরেখা বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়া আরো অনেক নতুন নতুন উপাদান ও উপসর্গ পরিলক্ষিত হচ্ছে যেগুলো তথ্য ও উপাত্তভিত্তিক আলোচনা ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। যেমন, বহুজাতিক করপোরেশন ও কোম্পানী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নতুন নতুন উদ্ভাবন ও উত্তরণ প্রভৃতি সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ প্রভাব রেখে চলছে। সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ও প্রতিবেশগত পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রের প্রতি হুমকি দেখা দিচ্ছে, বিপন্ন করছে আন্তঃরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

দক্ষিণ এশীয় দৃশ্যাবলী

সাম্প্রতিক বছগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্র ও আঞ্চলিক বিষয়ে গভীর আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। এ আগ্রহের উৎপত্তি ঘটে অবশ্য বৃটিশ ঔপনিবেশ–উত্তর কালীন দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন রাজনৈতিক সত্তার জন্মলগ্ন থেকে, কিন্তু নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর আন্তঃরাষ্ট্রিক কলহ, উপজাতীয়–জাতীয়তাবাদ প্রসূত অর্ন্তদ্বন্দ্ব, অব্যাহত সাম্প্রদায়িক সংকট, পারস্পরিক সম্প্রীতির অভাব প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার নেতিবাচক বা বিবদমান সম্পর্কের ভাব বহন করে। অন্যদিকে আশির দশকের প্রথম পাদ থেকে সার্ক গঠনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় ইতিবাচক সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে যদিও পশ্চিম ইউরোপ কিংবা এমনকি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মতো আঞ্চলিকতার ধ্যান–ধারণা এই অঞ্চলে এখনো যথার্থ দানা বেঁধে ওঠেনি। এসব বিষয়ে অনেক গবেষণা প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। দ্বন্দ্বের রূপরেখা দ্বারা, শান্তি ও সিস্টেম/সাবসিস্টেম কাঠামো দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্লেষণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহার

বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে, সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যা' প্রযোজ্য, অভিজ্ঞতাকে রহস্যমুক্ত করা ও সরল বা সহজ করা। জীবনের জটিলতাকে জটিলতর করা বা আরো রহস্যাবৃত করা নয়।[৪০] গবেষণার বিষয় হিসাবে নতুন হলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এ যাবৎ কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে। আদর্শবাদী, বাস্তববাদী ও বিশ্ববাদী গোষ্ঠীসমূহ পর্যায়ক্রমে বেশ প্রভাব রাখে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ব্যবহারবাদ ও ব্যবহারবাদ–উত্তরকালে গবেষণাকাজে সমন্বিত পদ্ধতির (eclectic method) প্রচলন হয়। এতে তত্ত্ব তার স্বকীয় বিশ্লেষণধর্মী স্বকীয়তা থেকে দূরে সরে আসে। অতি সম্প্রতি, আশির দশক থেকে তাত্ত্বিক প্রয়াস আপন ধারায় ফিরে আসা শুরু করেছে বলা চলে যা তাত্ত্বিক উন্নয়নে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে। সাম্প্রতিককালে জোর দেয়া হচ্ছে বিমূর্ত ধারার (abstract) চাইতে মূর্ত তত্ত্বের (concete theory) ওপর। এর অর্থ হচ্ছে নিছক ধারণাগত কাঠামোর মধ্যে তত্ত্বীয় প্রক্রিয়াকে সীমিত করে রাখা নয় যার মাধ্যমে কেবলমাত্র ঘটনাপ্রবাহকে শ্রেণীবদ্ধ বা বিন্যস্ত করা হয়; এখন লক্ষ্য হচ্ছে মৌলিক ব্যবহারিক প্রক্রিয়াকে অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক ফলাফলের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করা। মূর্ত তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণের লক্ষ্য হচ্ছে তত্ত্বকে শুধু বৈজ্ঞানিক রূপ দেয়া নয়, একে সমাদৃত ও আরো সর্বজনীন করা, রহস্যমুক্ত করা, অপ্রয়োজনীয় তত্ত্বীয় অলংকরণ থেকে সরিয়ে আনা – উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকে তুলে ধরা, উন্মুক্ত করা এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ও প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। অভিজ্ঞতাগত এই তত্ত্বের বাহন হচ্ছে বিজ্ঞানের দর্শন নয়, সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে আরো প্রখর করা।

সামাজিক বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত একটি নতুন ও বিতর্কিত বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণায় ধারণাগত রূপ প্রদানই হবে মূর্ত তত্ত্ব বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যথার্থ প্রথম পদক্ষেপ। নিঃসন্দেহে ধারণাগত প্রয়াস গবেষণার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং মুখ্য গবেষণার 'সমস্যা' ('problem')–কে সাময়িকভাবে কয়েকটি উপ–সমস্যায় ('Sub-problem') ভাগ করা যেতে পারে। এসব প্রস্তাবিত উপ–সমস্যার সঙ্গে মিল রেখে প্রণয়ন করতে হবে এমন কিছু 'প্রকল্প' (hypothesis') যা হবে পরীক্ষা বা প্রমাণ সাপেক্ষ।[৪১] এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্প গবেষণা সমস্যার গুণাগুণ যাচাই করতে পারে এবং একই সঙ্গে গবেষণালব্ধ জ্ঞান বাস্তব জীবন বা নীতি প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়।

তথ্য নির্দেশ

১. দ্রঃ Trygve Mathison, *Research in International Relations* (Oslo and London : 1963); also his *Methodology in the Study of International Relations* (New York and Oslo : 1959)

২. *Theory and Practice in Historical Study : A Report of the Committee on Historiography* (New York : Social Science Research Council 1946), Bulletin No-54.

৩. Raymond Aron, ``Conflict and War from the Viewpoint of Historical Sociology", in *Nature of Conflict* (Paris : UNESCO, 1957), পৃ ঃ ১৯০।

৪. J. David Singer, ``Inter-Nation Influence: A Formal Model" in James N. Rosenau (ed), *International Politics and Foreign Policy*, (New York : Free Press, 1969) Rev. Edn, পৃ ঃ ৩৮১

৫. James N. Rosenau, ``The External Environment as a Variable in Foreign Policy Analysis" in J. N. Rosenau, V. Davis, M. A. East (eds.) *The Analysis of International Politics* (New York : The Free Press, 1972), pp, 144-152

৬. থুকিডাইডিস বোঝাতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধে পুনর্ঘটিত ও দৃশ্যমান গতিধারা পরিলক্ষিত হয় এবং ভবিষ্যৎ "মানবিক ঘটনা প্রবাহ একে অপরকে প্রভাবিত না করলেও অবশ্যই পারস্পরিক সাদৃশ্যের পরিচয় মিলবে।" দ্রঃ *Thucydides, The Peloponnesian War* (New York : 1951), পৃ ঃ ৪–১৫

৭. Johan Galtung, ``On Peace Education", in Christoph Wulf (ed.), *A Handbook on Peace Education* (Oslo : 1968), পৃ ঃ ১৯৯

৮. Charles A. McClelland, ``Conceptualization, Not Theory", in Norman D. Palmer (ed), *A Design for International Relations Research* (Philadelphia : 1970), পৃ ঃ ৭৫

৯. Galtung, ``On Peace Education" *প্রাগুক্ত,* পৃ ঃ ১৬১

১০. এক্ষেত্রে খ্যাতনামা প্রথিতযশা সিষ্টেম তাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছেন, চার্লস এফ হারম্যান, জে, ডেভিড সিঙ্গার ও ম্যালভিন স্মল, ফ্রাঙ্ক এইচ, ড্যান্টন, আর, জে, রোমেল, টেরী হপম্যান, ওয়ারেন ফিলিপস প্রমুখ

১১. এ পর্যায়ে ব্রুস এম, রাসেট, এডওয়ার্ড ই, আজার, রিচার্ড রোজেনক্রন্স, মর্টন কাপলান, স্টিসভেন ব্রাম্স, ডিনা জিন্‌স প্রমুখের নাম উল্লেখ করা চলে।

১২. Michael P. Sullivan, *International Relations : Thearies and Evidence* (Englewood Ciffs, N. J. : 1976) পৃঃ ১৪৩–১৫৩

১৩. Michael Nicholson, *Conflict Analysis* (London : 1970), পৃঃ ২

১৪. Kenneth E. Boulding, *Conflict and Defense* (New York : 1962), পৃঃ ৫

১৫. W. Fred Cottrel, "Research to Establish the Conditions for Peace" *Journal of Social Issues,* XI, No. 1 (1955), পৃঃ ১৩

১৬. Karl W. Deutsch, *The Analysis of International Relations* (Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N. J. 1968), পৃঃ ১১৩

১৭. Johan Galtung, *Peace Research : Education, Action, Essays in Peace Research,* Vol. 1 (Copenhagen : 1975), পৃঃ ৭৮–৮১, ১৬৩। যুদ্ধ দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত গবেষণা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আরো দেখুন লেখকের প্রবন্ধ তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে *সমকালীনআন্তর্জাতিকরাজনীতি* (ঢাকা ঃ ১৯৯০)

১৮. N.J. Spykman, *The Geography of Peace,* (ed) Helen R. Nichel, (New York : 1944) পৃ ঃ ৪৫

১৯. ঐ পৃ ঃ ৬

২০. Abul Kalam. *Peacemaking in Indochina 1954-75* (Dhaka : University of Dhaka, 1983), পৃঃ ১৫

২১. G. Simmel, *Conflicts : The Web of Group Affiliations,* Trans. Kurt H. Wolff. (In 1. : The Free Prees of Glencoe, 1955), পৃঃ ১১৩

২২. Johan Galtung, " Violence, Peace and Peace Research," *Journal of Peace Resarch* (1968), পৃঃ ১৮৩

২৩. Michael Banks, ``A Critical Appraisal of Research and Teaching on Problems of Peace and Conflict Resolutions" in Christoph Wulf (ed.) *Handbook on Peace Education* (Oslo: UNICEF, 1974), পৃঃ৩৫–৩৭

২৪. Arthur Herzog, *The War-Peace Establishment* (New York and London: 1965), পৃঃ ১৯১

২৫. Adam Curle, *Peacemaking* (London: 1972). পৃঃ১৮০

২৬. ঐ, পৃঃ ৬৬

২৭. ঐ, *Making Peace* (London : 1971), পৃঃ ১৬

২৮. Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research" *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০৩

২৯. ঐ পৃঃ ১৮১

৩০. Martin Shubik, " Game Theory and the Study of Social Behaviour: An Introductory Exposition", in Martin Shubik (ed.) *Game Theory and Related Approaches to Social Behaviour* (New York: 1964), kO" 4-5, আরো দ্রঃ A Rapoport, *Strategy and Conscience* (New York : 1964)

৩১. T. C. Schelling, *The Strategy of Conflict* (New York : 1963). পৃঃ ৯–১০

৩২. A. Rapoport, "The Use and Misuse of Game theory", *Scientific American* (December 1962), পৃ ঃ ১১৮

৩৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ এনাটল র‍্যাপোপোর্ট–এর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে ক্রীড়া তত্ত্বের বিশেষ গুণ হলো এতে চিহ্নিত খেলোয়াড়দের যুক্তিযুক্ত সঠিক খেলা সম্পর্কিত পূর্ব ধারণা। দ্রঃ Anatol Rapoport, "Varions Meanings of Theory" *American Political Science Review*, vol. LII, (Dec., 1958), পৃঃ ৯৮৪

৩৪. ঐ

৩৫. Simmel, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৩

৩৬. Ruth Lane, 'Corcrete Theory : An Emerging Political Method," *American Political Science Review*, vol. 84, No. 3 (Sept, 1990) পৃঃ ৯৩৪–৯৩৫

৩৭. দ্রঃ, Robert J. Art, "A Defensible Defense : America's Grand Strategy After the Cold War," *International Security*, vol. 15, No. 4, (Spring 1991), pp. 6-53; Don. M. Snider and Gregory Grant, "The Future of Conventional Warfare and U. S. Military Strategy", *The Washington Quarterly*, vol. 15, no. 1 (1992), pp. 203-205

৩৮. Snider and Grant, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০৫–২২৮

৩৯. Samuel P. Huntington, "How Countries Democratize?" *Political Science Quarterly* (Winter 1990-91),Robart L. Rothstein,

"Democracy, Conflict and Development in the Third World", *Washington Quarterly* (Spring 1991)

৪০. Gerald H. Kramer উদ্ধৃত, in Ruth Lane, "Concrete Theory : An Energing Political Method". *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৯২৭

৪১. দ্রঃ Raymond Aron, "Theory and Theories in International Relations : A Conceptual Analysis," in Norman D Palrmer (ed.) *প্রাগুক্ত,* পৃঃ *৫৫–৬৫*, MeClelland, "Conceptualization, Not Theory", *প্রাগুক্ত* পৃঃ ৭২–৭৫, W. Fred Cottrel, "Research to Establish the Conditions for Peace", *The Journal of Social Issues,* Vol. XI, No.1 (1955), পৃঃ ১৩